তৃতীয় অধ্যায়

সূচনা থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রছোটোগল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

সূচনা থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রছোটোগল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

।। এক ।।

সমগ্র বাংলা সাহিত্য ধারায় 'ছোটোগল্প' নামক পর্বটি অতীব জনাগ্রাহী হয়ে ওঠার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পথিকৃৎ হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি খুব সহজে বলতে পেরেছিলেন, —

"ছোট প্রাণ ছোট কথা,
ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা,
নিতান্তই সহজ সরল।"[১]

জনজীবনের এই দুঃখ ব্যথাকেই তাঁর গল্পের প্রাণস্বরূপ বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। আর 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' মানব জীবনের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় ছোটো গল্পের প্রাণ, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরের পারিবারিক জমিদারির দায়িত্ব পেয়ে জমিদারি পরিদর্শনের সময় (বাংলা ১২৯৬, ইংরাজি ১৮৮৯)। এই ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে জানান, — "সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। .... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"[২] এই লেখা শুধুই চোখে দেখে নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে লোক সাধারণের রসসঞ্চারী ধারাকে নিজের সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার কাজে প্রয়োগ করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথই ছোটোগল্পে বাঙালির গ্রামীণ জীবনকে আধুনিক

মানুষের কাছে কুঁড়িফুলের পাপড়ির মতো বাতাবরণ করেছেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু যখন মানব সম্প্রদায় ও তাদের আবেগ, অনুভূতি, ভালো লাগা, মন্দলাগা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তখন সাহিত্যের লেখন শৈলীটিও সমগ্র পাঠক তথা মানব সম্প্রদায়ের একান্ত কাছাকাছি হওয়াটা স্বাভাবিক। লেখকের নিজের মনের ভাবকে সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য করে প্রকাশ করা যায়, লেখক যদি পাঠকের মনের সঙ্গে নিজের মনকে এক সেতুতে বাঁধতে পারেন, তাহলেই সাহিত্য সার্থকতা লাভ করতে পারে। আর এই সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য প্রকাশটি হল জীবন ও জগৎ এর সমন্বয় নিয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি সেই হৃদয় সংবেদ্য সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন, তার আভাস স্পষ্টত্ব ধরা পড়ে তাঁর ছোটোগল্পের আঙ্গিনায়। তাই রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে রোমান্সের উর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করলেও, তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান বিষয় প্রাকৃত ও মধ্যবৃত্ত বাঙালির জীবন নিয়ে।

ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরুচির। এই গল্প রচনাতে তিনি দিতে চেয়েছেন সংসারের রূঢ় স্পর্শ। ইতরতা ও জঘ্যতাকে বাদ দিয়ে তিনি রাখতে চেয়েছেন সদাসত্য বাস্তবতার প্রকাশ। তাই ছোটোগল্পের বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ---- ''আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতে ধরা পড়েছে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম, তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিলুম, তার পূর্বে আর কেউ করেনি।''[৩] জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরের প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি প্রভাব কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের। এই তিন বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যে অন্তরের অন্তঃস্থলের অবিচ্ছিন্ন আত্মিক সম্পর্ক সুগভীর ভাবে গড়ে উঠেছিল,

তা তাঁর প্রতিটি লেখনির পাতায় পাতায় আজও সুস্পষ্ট। এছাড়া বিহারের ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাবও তার জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কখনো কখনো তিনি জমিদারি সূত্রে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, কখনো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং শান্তিনিকেতন। আবার কখনো কখনো তিনি হাজারিবাগ, উড়িষ্যা এবং বিলেত যাত্রার জন্য আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাঁর অবাধ বিচরণ। ফলে সকল স্তরের পরিবেশ ও প্রাকৃত মানুষজনের এক কল্পচিত্র তাঁর হৃদয়াঙ্গ হয়ে ওঠে। তার বহিঃপ্রকাশের ফল এই অফুরন্ত সাহিত্য ভাণ্ডার। তিনি কোনও একটি গল্প, উপন্যাস, নাটক বা প্রবন্ধ যেখানে লেখা শুরু করেছেন, সেখানে শেষ করেননি, বরং শুরু করেছেন এক জায়গায়, আর শেষ করেন অন্যত্রে। এক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার একাকিত্য গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় তাঁর প্রতিটা পর্বে পর্বে। এ প্রসঙ্গে পোস্টমাস্টার গল্পটি লেখার ইতিহাস আমরা উল্লেখ করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে জানান, — ''এখানকার পোস্টমাষ্টার এক একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। ..... পোস্টমাষ্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গভীর ভাবে বলে যায়'। এই সব জীবনযাত্রা, এই সব চরিত্র অভিজ্ঞতারূপে তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে, কিছুদিন পরে হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার তাগিদে ঝরে পড়েছে গল্পের ধারায়। গল্পটাতে শুধুই পোস্টমাষ্টার চরিত্রটুকু বাস্তব, বাকিটুকু কল্পনা - কিন্তু সেই কল্পনার কারিগরিতে বাস্তব পোস্টমাষ্টারকে অতিক্রম করে কল্পনার রতন চরিত্রটি তার নীরব বেদনা নিয়ে রসস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।''[৪] আবার 'দুরাশা' গল্পটি রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে এক চিঠিতে বলেন, — ''অনেক কাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলি জেদ

করতেন। এই গল্পটা ('দুরাশা') তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে রচিত।"[৫] এখানে তিনি কল্পনাকে কেন্দ্র করে বাস্তবটাকে অতিবাস্তব করে তোলেন। রাস্তায় দুদিকে যা দেখেছেন তা গল্পে জীবিত হয়ে উঠেছে। তিনি হৃদয় দিয়ে কল্পনা করে পাঠককে হৃদয়বান করেছেন, যা পাঠকের কাছে একটি জীবন্ত চিত্র। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর অসাধারণ কুশলী রচনা ও ভাষা শৈলীর মহত্বে।

কবির সম্মুখে ঘটে যাওয়া বাস্তবতার সঙ্গে অন্তরে সুপ্ত কল্পনাকে একত্রিত করে কিভাবে নিজের কলমের খোঁচায় সেই ঘটনাকে জীবন্ত করেন, সে প্রসঙ্গে তাঁর সাজাদপুরে বসে একটি লেখার প্রাক-কথা এখানে উল্লেখিত, — "বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটি প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছিল – একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদী তীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত্র ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে — আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে।"[৬] এই রমণীয় কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সেতু রচনার আরো একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর কুশলী কলমের খোঁচার শৈলী। যার মাধ্যমে সাহিত্যকে বাস্তবায়িত করে তোলা, হৃদয়াঙ্গ করে তোলা এবং আমাদের ঘরে নিত্য ঘটে যাওয়া ঘটনা একেবারে কাছাকাছি কিভাবে নিয়ে আসা সম্ভব তা তিনি দেখিয়েছেন। সুতরাং জগৎ ও জীবন নিয়েই রবীন্দ্র গল্পসাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু। তাই নিজস্ব সুকুশলী শৈলী

রচনায় ও বিষয়ের প্রকাশ ভঙ্গিমাতে রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনকে কোনও ভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ সেই জগৎ ও জীবনের অতিমূল্যবান এবং বিশিষ্টাঙ্গ, যার সুপ্রচুর ব্যবহার করেছেন নিজের গল্পসাহিত্যে। প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি কিভাবে তাঁর সাহিত্যে মিশে গিয়ে শৈলী রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা রবীন্দ্রগল্প অবলম্বনে আমরা সে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। রবীন্দ্রনাথ গল্পে যে প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, তা রবীন্দ্ররচনাবলীর গল্প খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদ, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুলির একটি তালিকা নিম্নে তার বর্ণনা করা হল। এই তালিকায় তাঁর কাহিনির উদ্দেশ্যগত এবং প্রযুক্তিগত, ব্যবহার ও বিশ্লেষণকে বুঝে নিতে সাহায্য করবে।

।। দুই ।।

১। আকাশ হইতে পড়া (মানভঞ্জন, ঠাকুরদা)

২। অকূল পাথারে পড়া (মানভঞ্জন)

৩। অগ্নিমূর্তি (দেনাপাওনা, দিদি)

৪। অগ্নিশর্মা (আপদ, মানভঞ্জন, তপস্বিনী)

৫। আকাশ-পাতাল (মুকুট, মহামায়া, বোষ্টমী)

৬। আকাশ কুসুম (প্রায়চিত্ত)

৭। আষাঢ়ে গল্প (একটা আষাঢ়ে গল্প)

৮। ইঁচড়ে পাকা (এক রাত্রি)

৯। উড়ে এসে জুড়ে বসা (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

২০। কথায় কথায় (দেনাপাওনা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, দিদি, রাজটিকা)

২১। কড়ায় গণ্ডায় (শাস্তি)

২২। কাঁচাসোনার প্রতিমা (মহামায়া)

২৩। কাঁচাকাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরা (মানভঞ্জন)

২৪। কিংকর্তব্য বিমূঢ় (দালিয়া)

২৫। কুবেরের ভাণ্ডার (স্বর্ণমৃগ, প্রতিহিংসা)

২৬। খিচুড়ি পাকানো (দুরাশা, ক্ষুধিতপাষাণ)

২৭। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে (মেঘ ও রৌদ্র)

২৮। গায়ে পড়িয়া আলাপ (সম্পাদক, প্রতিহিংসা)

২৯। গোকুলে বাড়া (সম্পাদক)

৩০। গোঁফে তা দেওয়া (সমাপ্তি)

৩১। চোখের মণি (স্বর্ণমৃগ, জীবিত ও মৃত)

৩২। চুলচেরা বিচার বা ভাগ (শাস্তি)

৩৩। চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পরে ধরা (অধ্যাপক)

৩৪। চোখের মাথা খাওয়া (মুক্তির উপায়)

৩৫। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা (দেনাপাওনা)

৩৬। ছোটো মুখে বড়ো কথা (দালিয়া)

৩৭। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তোলা (পোষ্টমাষ্টার)

৩৮। জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ (সমস্যাপূরণ)

৪০। তিলকে তালকে করা (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

৪১। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো (মুকুট)

৪২। দু নৌকায় পা (রাজটিকা)

৪৩। নবাব পুত্তুর (দেনাপাওনা)

৪৪। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা (পুত্রযজ্ঞ)

৪৫। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না তাহলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে (ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে) (অসম্ভব কথা)

৪৬। প্রজাপতির নির্বন্ধ (দিদি)

৪৭। বয়সের গাছ পাথর (মুক্তির উপায়, মাল্যদান)

৪৮। বজ্রাঘাত (মহামায়া, নামঞ্জুর গল্প, দিদি)

৪৯। বর্গির হাঙ্গামা (সমাপ্তি)

৫০। বিন্দু বিসর্গ (দুরাশা)

৫১। বালির বাঁধ (একটা আষাঢ়ে গল্প)

৫২। ব্রাহ্মণের জাত মারা (ত্যাগ)

৫৩। মরণকালে বুদ্ধিনাশ (রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা)

৫৪। মধু যেমন হুলও তেমন (রাজটিকা)

৫৫। মায়াকান্না (রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা)

৫৬। মান্ধাতার আমল (একটা আষাঢ়ে গল্প)

৫৭। মাথায় বজ্রাঘাত (কাবুলিওয়ালা)

৫৮। মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর(রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা)

৫৯। মুখ হাঁড়ির করা (অসম্ভ কথা, মাষ্টারমশাই)

৬০। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ (রাজটিকা)

৬১। যুদ্ধং দেহি (জয় পরাজয়)

৬২। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী (দেনাপাওনা)

৬৩। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায় (দৃষ্টিদান)

৬৪। শত্রুর মুখে ছাই (রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা)

৬৫। ষোলআনা (কাবুলিওয়ালা, অসম্ভব কথা)

৬৬। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে (একটা আষাঢ়ে গল্প)

৬৭। সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া (একটা আষাঢ়ে গল্প, অসম্ভব কথা)

৬৮। সাত রাজার ধন মালিক (মুকুট, আপদ)

৬৯। সোনার চাঁদ (মুকুট, রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা, স্ত্রীরপত্র)

৭০। সোনার কাঠি রূপার কাঠি (একটা আষাঢ়ে গল্প)

৭১। স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী (মনিহারা)

৭২। হাতে হাতে (মুকুট, দেনাপাওনা)

৭৩। হিতে বিপরীত (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

।। তিন ।।

তালিকানুসারে প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ গুলি গল্পের মধ্যে কতখানি যথার্থ ব্যবহার ও বিশ্লেষিত হয়েছে, তার অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করতে গেলে, কিংবা প্রত্যেকটি প্রবাদের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার জানতে গেলে গল্পের প্রেক্ষাপটটিকে বুঝতে হবে। সে কারণেই গল্পের আলোচনার সঙ্গে সমতালেই প্রবাদগুলির প্রয়োগগত যুক্তি কেমন বা কতটা ছিল তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব।

'আকাশ থেকে পড়া' বাগধারাটির অর্থ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'প্রতিহিংসা' গল্পে বাগধারাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক অন্য কৌশল অবলম্বন করেছেন। গল্পের কাহিনির কৌশল বর্ণনাতে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। গল্পের মুকুন্দবাবুর দেওয়ান ছিলেন গৌরীকান্ত, উভয়ের মৃত্যুর পর মনিব ও দেওয়ানের পদাভিষিক্ত হয়ে আছে মুকুন্দবাবুর পোষ্যপুত্র বিনোদবিহারী ও গৌরীকান্তের নাতজামাই অম্বিকাচরণ। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে আগের মতো সহজ সরল সম্পর্ক নেই। অম্বিকাচরণের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি গৃহিনীর ঈর্ষাজনিত কূটচক্রান্তে ও মন্ত্রণায় বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণকে বরখাস্ত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু অম্বিকাচরণের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকায় বিনোদবিহারী সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। অবশেষে অম্বিকাচরণের অসুস্থতা উপলক্ষ্যে সে সুযোগ বিনোদবিহারী পেয়ে যায়। অম্বিকার অজান্তে তার উপর প্রদত্ত কর্মভার সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র সরানো হয়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে অম্বিকাচরণ আর সব অন্যান্য কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলে 'সকলেই যেন

আকাশ হইতে পড়িল।' এখানে লেখক ঘটনা বর্ণনায় বাগধারাটির প্রকৃত রূপটি যথার্থ বজায় রেখেছেন। একই অর্থে উক্ত বাগধারাটি 'রাজটিকা' গল্পে ব্যবহৃত।

'অকূল পাথারে ভাসা' বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছটি গল্পে লেখক সমূহ বিপদ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'মানভঞ্জন' গল্পে গান্ধর্ব থিয়েটারের আয়োজনে 'মনোরমা' নাটকের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন সারা-কলিকাতা শহরটা পোষ্টারে মুড়ে ফেলেছে। এমন সময় গোপীনাথ অপমানের প্রতিশোধ নিতে নাটকের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে নিয়ে অন্তর্ধান হলে তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমন অবস্থা থিয়েটার ওয়ালাদের কাছে অকূল পাথারে পড়ে ভাসার সামিল হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সম্মুখে ঘোর বিপদ বা অসহায় অবস্থা বোঝাতে শব্দগুচ্ছের যথার্থ ব্যবহার হয়েছে।

'অগ্নিমূর্তি' শব্দটি বিশিষ্টার্থক শব্দ হিসাবে পরিগণিত। যার অর্থ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া। 'দেনাপাওনা' গল্পে অপমানিত হওয়ার পর, সব কিছু ভুলে গিয়ে মেয়ে নিরুপমার জন্য তার শেষ সম্বল বাড়িটা বিক্রি করে, বাকি পণের টাকা সংগ্রহ করেন। এমন সময় তার জ্যেষ্ঠপুত্র তার দুটি ছেলের হাত ধরে রামসুন্দর কাছে উপস্থিত হয়, এবং পিতার গোপন রাখা কথাটা প্রকাশ করায় ----''রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব।''[৭] তিনি এতটাই অপমানিত যে নিজের ছেলেদের প্রতি কোনও মায়াদয়া না করে, বরং তাদের প্রতি অগ্নিরূপ ধারণ করেন। একই অর্থে ঐ বিশিষ্টার্থক শব্দটি 'দিদি' গল্পে প্রয়োগ করেছেন লেখক।

'অগ্নিশর্মা হওয়া' এটি একটি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, যার অর্থ ক্রুধে ক্ষিপ্ত হওয়া। 'আপদ' গল্পে কলকাতা থেকে আনা সতীশের অতিযত্নের দোয়াতদান ঘর থেকে চুরি হয়ে গেলে এই সন্দেহের তীর পরিচয়হীন কিরণের যত্নে পালিত নীলকান্তের দিকে যায়। সতীশের স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালে দোয়াতদান খুঁজে পাওয়া না গেলে বউদি কিরণ হেসে বললেন, ----

''ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।' কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল।''[৮] কারণ কিরণের আদরে আশ্রিত নীলকান্ত। সতীশ নীলকান্তকে কোনও ভাবেই সহ্য করতে পারত না। সে পরিবারের কেউ নয় অথচ সতীশের বউদি, কিরণ নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে। যা সতীশের পছন্দ নয়, তাই সতীশের দোয়াত চুরির সম্পূর্ণ অপবাদ নীলকান্তের উপরে গিয়ে পড়েছে।

'আকাশ-পাতাল' শব্দগুচ্ছটির মধ্যে লেখক 'আকাশ-পাতাল ভাবা' গভীর ভাবনায় বাগধারার অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যার অর্থ বহু বিভিন্ন ও অসংলগ্ন কথা ভাবা বা গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত থাকা। 'মুকুট' গল্পে আরাকানপতি রাজের কাছে ত্রিপুরার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের পরাজয়ের কাহিনি, যুবরাজ একাকী জ্যোস্নারাতে গভীর ভাবে সত্য ঘটনার স্মৃতিচারণে ব্যাস্ত, — ''এমন সময় ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশ-পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া 'এসো ভাই' বলিয়া আলিঙ্গনের জন দুইহাত বাড়াইয়া দিলেন।''[৯] 'মুকুট' গল্পে 'আকাশ-পাতাল' শব্দগুচ্ছটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'আকাশ-পাতাল' শব্দগুচ্ছটি পূর্বের গল্পে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অর্থানুসারে 'মহামায়া' ও 'বোষ্টমী' গল্পে প্রয়োগ হয়নি। এখানে একটু অন্য মাত্রায় দেখা যায়।

'মহামায়া' গল্পে 'আকাশ-পাতাল' শব্দগুচ্ছটি সর্বত্র সব কিছু অর্থে ব্যবহৃত। রাজীব মহামায়াকে না পাওয়ায় তার হৃদয়ে একটা গভীর দুঃখের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এমন সময়ে অনুরূপ ভাবে বাহ্য প্রকৃতিতে মহাবিপ্লবের উপস্থিতি। তখন — ''তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনো রূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না। প্রকৃতি আকাশ-পাতাল

জুড়িয়া ততটা শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।" 'বোষ্টমী' গল্পেও এটা একই অর্থে প্রযোজ্য।

'আকাশ-কুসুম' অর্থাৎ অবাস্তব বা অসম্ভব্য বস্তু। লেখক 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বিশিষ্টার্থক শব্দটি এই ভাবে ব্যবহার করেছেন যে, — ''স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুম অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। .... কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই।"[১০] স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভেসে চলেছেন যা সাধারণের কাছে অবাস্তব। ঠিক তেমনটি ঘটেছিল অনাথবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনে। সকলের বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করলে তার কাছে অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু তিনি কোনও কিছুতেই সফলতা পায় নি। অর্থাৎ তিনি অনেক কিছু হতে পারতেন কিন্তু অদৃষ্টের ভ্রমে পড়ে তাহার কিছু একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব হয়েছিল। অনাথবন্ধুর স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে শব্দটির যথার্থভাবে ব্যবহার করেছেন লেখক।

'আষাঢ়ে গল্প' বাগধারাটি রবীন্দ্রনাথ গল্পের শিরোনামে ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ অলীক বা অবিশ্বাস্য কাহিনির বর্ণনা দেওয়া। গল্পটির বিষয় বস্তু পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে অবাস্তব ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাই গল্পের শিরোনামে বাগধারাটির ব্যবহারে যথার্থতা আছে। অন্যদিকে 'দর্পহরণ' গল্পে নির্ঝরিণীর স্বামীকে বাংলায় পরম পণ্ডিত বোঝানো এবং নিজের লেখা বাস্তব গল্পটি অলীক প্রমাণের জন্য লেখক উল্লেখিত বাগধারাটি প্রয়োগ করেন।

'ইঁচড়ে পাকা' বাগধারাটি 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক বা কথকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করিয়েছেন। এটির অর্থ অল্প বয়সে প্রবীন ব্যক্তির মতো আচরণ করা বা কথা বলা। আসলে কলকাতার পরিবেশে বসবাসকারী

ছেলেদের থেকে পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের শান্ত স্বভাব বোঝাতে লেখক এই বাগধারাটির উল্লেখ করেছেন। তারা কলকাতার ছেলেদের মতো সব কিছুতেই পরিহাস করতে পারে না। বরং তাদের মধ্যে যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আছে, যা শহুরে অল্প বয়সে পাকা ছেলেদের ভিতরে নেই। এই ভাব বোঝানো ক্ষেত্রে লেখক উক্ত বাগধারাটি যথার্থ প্রয়োগ করেন।

'উড়ে এসে জুড়ে বসা' অর্থাৎ নিঃস্বত্ত্বীয় প্রবল ব্যক্তি কতৃক প্রভুত্ব স্থাপন। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে গুরুচরণের বিষয় সম্পত্তি তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বরদাসুন্দরীর পাপ্য। কিন্তু নবদ্বীপের মায়ের ধারণা গুরুচরণ নিঃসন্তান, তাই তার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, ভাই রামকানাইয়ের পুত্র নবদ্বীপ। যেহেতু বরদাসুন্দরী দ্বিতীয় পক্ষের, তাই গুরুচরণের পরলোক গমনের পর সে এই পরিবারের কেউ নয় বলে দাবি নবদ্বীপের মায়ের। গল্পে নবদ্বীপের মায়ের কথনে লেখকের ভাষায়, — ''কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া, ইহা কোন সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিয়ে পারে।''[১১] এখানে লেখকের ব্যবহৃত উদ্ধৃতি চিহ্নে প্রবাদটি নবদ্বীপের মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়ে বরদাসুন্দরীর প্রতি আশাহতদের যে চরম হিংসা তা স্পষ্ট করেন।

'কথায় কথায়' পদগুচ্ছটির অর্থ প্রতি কথায় বা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা। গল্পে লেখক কথিত ভাবনায়, যখন রামসুন্দরের কাছে বাকি থাকা পণের টাকা রায়বাহাদুরকে দিতে যায়, সেই প্রসঙ্গে লেখক বলেন, — ''অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, হাঁ হাঁ বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে।''[১২] এখানে বোঝা যায় 'কথায় কথায়' পদগুচ্ছটির অর্থ এক প্রসঙ্গ থেকে অন্যান্য প্রসঙ্গ যাওয়া। বেহাই বাড়িতে এসে রামসুন্দর টাকার প্রসঙ্গ তোলার পূর্বে, হরেকৃষ্ণ বাড়িতে চুরির প্রসঙ্গ, নবীনমাধব ও রাধামাধবের বিদ্যাবুদ্ধির প্রসঙ্গ, শহরে নূতন ব্যামোর প্রসঙ্গ বলার পরে রামসুন্দর টাকার

কথা তোলেন। সুতরাং আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে পদগুচ্ছটির নূতন অর্থে প্রয়োগ করেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থে 'কথায় কথায়' পদগুচ্ছটি 'রাজটিকা' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন। আবার 'কথায় কথায়' পদগুচ্ছটি প্রতি কথায় এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে পরিবারের কাছে তারাপ্রসন্ন একজন প্রভাবশালী, বাগপটু, চালাক এবং তাই সহজে সে বাগযুদ্ধে স্ত্রীকে পরাজিত করতে পারে। এই স্বভাবের জন্য, --- ''এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রীর দাক্ষায়ণী ও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিনী কথায় কথায় বলেন, নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।''[১৩] সমানার্থে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি চিহ্নের পদগুচ্ছটি 'দিদি' প্রভৃতি গল্পে প্রয়োগ করেছেন।

'কড়াগণ্ডা বা কড়ায় গণ্ডায়' 'শাস্তি' গল্পে লেখক বিশিষ্টার্থক শব্দটি পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ অর্থ হিসাবে প্রয়োগ করেন। আদালত হল মানুষের সেই স্থান যেখানে এসে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়, তাদের অধিকারকে কড়ায় গণ্ডায় অর্থাৎ তিলমাত্র না ছেড়ে সব কিছু বুঝে নিতে। এরকম একটি চিত্র লেখক 'শাস্তি' গল্পে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে 'প্রতিহিংসা' গল্পে গৌরীকান্ত প্রভুভক্তির দেনা তিলমাত্র বাকি না রেখে সম্পূর্ণ শোধ করতে রাজি, কিন্তু মুকুন্দলালের ছেলের সঙ্গে মেয়েকে বিবাহ দিতে রাজি নয়, গল্পে কর্মের ফল আদায় করা অর্থে উদ্ধৃতি চিহ্নের বিশিষ্টার্থক শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন।

'কাঁচা সোনার প্রতিমা' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির মূলার্থ কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল এমন কিছু। এখানে লেখক উপমা অলংকারের বৈশিষ্ট্য আরোপ করে শব্দগুচ্ছটির ব্যবহারিক তাৎপর্যকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার রূপ সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা এভাবে বলেছেন, ---

''মহামায়া কুলীন ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা — সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।''[১৪] তার রূপের উজ্জ্বলতা কাঁচা সোনার রংকেও হারমানানোর মতো। ঠিক তেমনি 'অসম্ভব কথা' গল্পে একই অর্থের নিরিখে 'সোনার প্রতিমা' শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ হয়েছে।

'কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরা' এটি একটি জনপ্রিয় প্রবাদ। মূল প্রবাদটি ছিল 'কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা' 'মানভঞ্জন' গল্পে গোপীনাথ ও গিরিবালার দাম্পত্য ভালোবাসায় তাদের জীবন পরিপূর্ণ। গোপীনাথ কেবলই একজন স্বামী। পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদনের পালা একেবারে শিঙ্গার রস পর্যায়ে ছিল, এমন সময় গোপীনাথের পিতার মৃত্যু হলে সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব গোপীনাথের স্কন্ধে এসে পড়ে। গোপীনাথ হয়ে উঠলো সংসারের কর্তা, অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ায় তার হৃদয়ের সঞ্চারিত গিরিবালার প্রতি প্রণয়ালাভের বৃত্তগুলি তিলে তিলে শেষ হতে থাকে। এরকম পরিস্থিতি বোঝাতে লেখক বলেছেন, — 'কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে।' ঠিক যেরকম 'কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।''[১৫] এখানে লেখক মূল প্রবাদটি পরিবর্তন করে নিজের মতো অর্থ অপরিবর্তীত রেখে ভাবকে ব্যবহার করেছেন এখানে।

'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ হল কি করা উচিত, সে জ্ঞান লুপ্ত হওয়া বা হতবুদ্ধিতে পরিণত হওয়া। 'দালিয়া' গল্পে গল্পকার সমগ্র বিষয়কে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রথমত উচ্চ, যে সর্বচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, দ্বিতীয়ত মধ্য অর্থাৎ যে উচ্চের দাস, এবং নিম্ন বা ছোটোর কাছে প্রভু। আর এদের মধ্যে অবস্থানকারীরা পরিপূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্রগোছের। উচ্চ ও

নিম্নের মধ্যে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হলে মধ্যবর্তীরা সহজে কোনও কিছু ভেবে উঠতে পারে না। তেমনটি ঘটে ছিল শাহজাদী জুলিখার ভিতরে। সে শাহজাদী আমিনা এবং ধীবর পাড়ার দালিয়ার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক তা অনুভব করে। তাই সে না পারছে আমিনাকে কিছু বলতে, আর না পারছে দালিয়াকে শাসন করতে। এক্ষেত্রে লেখক শব্দগুচ্ছটি যথার্থ ভাবে নির্বাচন করে প্রয়োগ করেছেন।

'কুবেরের ভাণ্ডার' অশেষ অর্থ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী যিনি বা যে স্থান। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে বৈদ্যনাথের সংসার চলে জন-সাধারণের প্রয়োজনীয় ছড়ি তৈরি করে, তাতে স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী সন্তুষ্ট নয়, তিনি আদ্যনাথের স্ত্রীর মতো থাকতে চাই। এ নিয়ে বৈদ্যনাথের সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা অশান্তি লেগে আছে। তবুও তার পক্ষে চাকরি বা ব্যবসা করা সম্ভব নয়, তাই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৈদ্যনাথ কম সময়ের মধ্যে বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সেই চিন্তায় মেতে উঠেছে, অর্থাৎ সে অতি সংক্ষেপে 'কুবেরের ভাণ্ডারে' প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজে বার করতে চাই। উদ্ধৃতি চিহ্নের বাগধারাটি একই প্রয়োগগত অর্থে 'প্রতিহিংসা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন।

'খোঁড়ার পা খানায় পড়ে' অতি পরিচিত ও জন সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রবাদটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন, — ''খোঁড়ার পা খানায় পড়ে — যে কেবল খানার দোষ নয়, খোঁড়ার পা-টার ও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ তাহার একটা প্রমান দিলেন।''[১৬] গল্পের নায়ক শশীর হৃদয়ে দেশ ও দশের জন্য একটা আলাদা জায়গা তৈরী হয়েছিল। ফলত তাদের প্রতি কারোর অন্যায় অবিচার দেখলে শশী সহ্য করতে পারত না। কিন্তু যাদের জন্য শশীর বৃহৎ ত্যাগ, তারা শশীর কাছে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়, বরং তারা শশীকে বারে বারে বিপদের সম্মুখীন করেছে। ইংরেজ শাসনকালে দরিদ্র জেলেদের জাল পুলিশ

বাহাদুরের নির্দ্দেশে টুকরো টুকরো করে দিলে, শশী এই অন্যায় সহ্য করতে না পেরে পুলিশ বাহাদুরের সঙ্গে হাতাহাতি করেন। এই ঘটনাক্রমে শশীকে নিয়ে আদালতে মামলা মোকদ্দমা শুরু। শশী ঐ ক্ষতিগ্রস্থ জেলেদেরকে সাক্ষী হিসাবে চাইলেও তারা শশীর পাশে এসে দাঁড়ায়নি, বরং তারা আদালতে শশীর বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন। দৈহিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তির খানায় পড়ার দিকে যেমন একটা প্রবণতা থাকে, ঠিক তেমনি কিছু ব্যক্তি থাকে যারা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না থেকেও আকস্মিক ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এখানে লেখক শশীর চরিত্রটি এভাবে গড়েছেন। দীন দরিদ্র মানুষের বিপদের দিনে যখন শশী গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা শশীর অবস্থা খোঁড়ার পা খানায় পড়ার মতো হয়েছে। কারণ যে প্রতিবাদী, দেশ ও দশের জন্য অনেক বিপদ বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যাদের জন্য তাঁর এই প্রতিবাদ, তার মূল্য শশী পায়নি, বরং তাকে বহু পরিমানে খেশারত দিতে হয়েছে। প্রবাদটির মূলার্থ অসহায় ব্যক্তি বেশি করে সমস্যায় কন্টকিত হওয়া। এখানে শশীভূষণ অসহায় নয়। প্রবাদের খোঁড়া ব্যক্তির প্রবণতার সাথে লেখক শশীভূষণের প্রবণতাকে মিলিয়ে নিয়ে প্রবাদটির নূতন ব্যঞ্জনা দান করেছেন। শশীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রবাদটির প্রয়োগগত অর্থে ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

'গায়ে পড়ে ভাব বা ঝগড়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ নিজে উৎসাহিত হয়ে বা জোর করে ভাব বা ঝগড়া করা। 'সম্পাদক' গল্পে কথক সম্পাদক মহাশয় জাহির গ্রামের জমিদারের প্রকাশ করা কাগজের বেতনভোগী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। কাগজে তাঁর লেখা ও মুখের কথা শুনে জাহির গ্রামের জমিদার, সাধারণ মানুষ তাকে এক সময় খুব সম্মান করত। কিন্তু কূটকৌশলী আক্রমণের কথাবার্তা শত্রু-মিত্র কেউ বুঝতে পারত না। ফলত তাঁর এই স্বভাব জমিদার ভালো ভাবে দেখেন নি, তিনি তার প্রতি সমাদর

এবং সম্মান করেন না। পূর্বের মতো রাস্তা-ঘাটে কেউ যেচে কথা বলে না, বরং তাকে দেখে কেউ কেউ লুকিয়ে-চুরিয়ে আবার কেউ কেউ প্রকাশ্যে হাসতে থাকে। এই প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ গায়ে পড়ে ভাব বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ করেন। আবার অন্যদিকে ঝগড়া বা গণ্ডগোল প্রসঙ্গে 'প্রাশ্চিত্ত' ও 'প্রতিহিংসা' গল্পে ব্যবহৃত।

'গোকুলে বাড়া' এটি একটি প্রবাদাংশ। যার অর্থ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা বা ক্রমশ প্রকাশ্য। 'সম্পাদক' গল্পে মধ্যবৃত্ত ঘরে কন্যাদায় যে এক বড়ো দায়, তা গল্পের কথক স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। কথক সম্পাদক মহাশয়ের কন্যা প্রভা এখন ছোটো, তাই তার উপযুক্ত, যোগ্য, সৎ ও চরিত্রবান পাত্র কন্যাদায় গ্রস্থ কথকের মেয়ের জন্য ধীরে ধীরে প্রভার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হচ্ছে তা তিনি খেয়াল করেননি। উপযুক্ত সময়ে তার জন্য বাক্স জোগাড় হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে লেখক প্রবাদাংশটি প্রয়োগ করেন।

'গোঁফে তা দেওয়া' এটি একটি প্রবাদাংশ, মূল প্রবাদটি হল 'গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকানো'। প্রবাদাংশটির অর্থ অলসতা ও অকর্মণ্যতা। 'সমাপ্তি' গল্পে ভালো করে সাজিয়ে গুজিয়ে পাত্রী মৃন্ময়ীকে অপূর্বর সামনে উপস্থিত করলে পাত্রী লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ না হওয়ায় অপূর্ব কিছু চিন্তাভাবনা করার পর মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোন ক্লাসে পড়ে। ওখানে বসে অপূর্বর এই গভীর চিন্তাভাবনাকে লেখক গোঁফে তা দেওয়ার ভাবনায় উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবাদাংশকে গল্পের কনটেক্স অনুসারে প্রয়োগ করেছেন অপূর্বর ভাবমূর্তিকে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেন।

'চক্ষের মণি বা চোখের মণি' সকলের মুখে ব্যবহৃত এই বাগধারাটির মূলার্থ অতি প্রিয় বস্তু। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে দুই কুলহারা বিধবা বধূ কাদম্বিনীর কাছে জমিদার শারদাশংকরবাবুর ছোট্টো ছেলেটি তাঁর অতি আদরে

লালিত ও পালিত এবং তার প্রতি তাঁর প্রাণের টান অধিক। তাকে হারাতে যেন না হয়, এই ভয় কাদম্বিনীর ভিতরে উপস্থিত। তাই ছোটো ছেলেটি কাদম্বিনীর চোখের মণি।

'চুল চেরা বিচার বা ভাগ' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি 'শাস্তি' গল্পে অতি সূক্ষ্ম বিচার বা ভাগ অর্থে লেখক উল্লেখ করেছেন। মূলত আদালত হল মানুষের সেই বিশ্বাসের জায়গা যেখানে গেলে সকলে তাদের সমান অধিকার বুঝে পায়। যেখানে প্রত্যহ কত লোকের আগমন, যারা নিজের সমস্যা সমাধানে সেখানে উপস্থিত হয়, কিন্তু অবশেষে ছিদাম সেখানে গিয়ে এবং সত্য কথা বলেও পূর্বের মিথ্যাকে সত্য নয় বলে প্রমাণ করতে পারল না, পারল না তার স্ত্রী চন্দ্ররাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে সে আদালতের নিরপেক্ষ বিচারে দোষী।

'চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা' প্রবাদটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের মুখে মুখে প্রচলিত এবং পরিচিত। 'অধ্যাপক' গল্পে লেখক প্রবাদটি নতুন ভাবে কুশলী প্রয়োগ করেছেন। উক্ত প্রবাদটিকে লেখক নিজস্ব ভঙ্গিতে রূপায়িত করলেন এইভাবে — ''চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা এমন কি ধরা পড়িলেও।''[১৭] গল্পটির কথকের সম্মান রক্ষার্থেই প্রবাদটির এরূপ প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই গল্পে বর্ণিত প্রবাদটি প্রভাব ও গুরুত্ব অবশ্যই আছে। গল্পের কথক একটি উচ্চ শ্রেণির নাটক লিখেছিলেন। সেই নাটকের পাঠশুনে বামাচরণবাবু সমালোচনায় বলেন সে, — ''এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূল্য ভাবটি গেটে রচিত 'টাসো' নাটকের অনুকরণ, এমনকি অনেক স্থলে অনুবাদ''[১৮] কথক ধরা পড়ে যাওয়ায় নিজের চুরির দোষ স্খালনের সাক্ষ্য স্বরূপ কথক প্রবাদটির বিপরীত অর্থবোধক রূপকেই ব্যবহার করেছেন, এবং বামাচরণের সমালোচনার প্রতিবাদ করে মনে মনে ভেবেছেন, যার ওরিজিনালিটি বেশি সেই চুরি করতে সাহস করে, কিন্তু সে স্থলে চুরির

বস্তুকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই নিয়মে কথকের সৃষ্টি মৌলিক।

'চোখের মাথা খাওয়া' প্রবাদবাক্যটির বাচ্যার্থ নিজের চক্ষু খেয়ে ফেলা বা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করা। কিন্তু এই শব্দগুচ্ছটির ব্যঞ্জনার্থ চোখ থাকতেও না দেখতে পাওয়া। এখানে বাচ্যার্থ নয়, ব্যঞ্জনার্থের প্রয়োগ হয়েছে। 'মুক্তির উপায়' গল্পে গৃহত্যাগী ফকিরচাঁদ নবগ্রামের গৃহত্যাগী মাখনলালের গ্রামের এসে উপস্থিত হয়। তাতে মাখনের বাবা ষষ্ঠীচরণ মাখনলাল ভেবে ফকিরচাঁদকে আঁটকে রাখে। ফলত ফকিরচাঁদ মাখনলালের পরিচয়ে সেখানে থাকতে বাধ্য হয়। এক সময় মাখনের দুই স্ত্রী ফকিরচাঁদের সামনে উপস্থিত, তখন ফকিরচাঁদ বলেন, — ''মা আমি তোমাদের সন্তান''[১৯] বলে মাথানত করে প্রণাম করতে গেলে, অমনি দুই স্ত্রী গলার ঝংকার দেওয়া সুর সমগ্র পাড়াটা কাঁপিয়ে দিয়ে বলে উঠল, — ''চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস? তোর মরণ হয় না''[২০] অর্থাৎ দুই স্ত্রীর ধারণা মাখনলাল তাদেরকে চিনতে পেরে, না চেনার ভান করছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য। কারণ তিনি কোনও ভাবেই রদবদল না করেই, গ্রাম্য মানুষজন এবং গ্রাম্য রমনীদের মুখের ভাষাকে সরাসরি নিজ সাহিত্যে গ্রহণ করেছেন।

'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা' যার অর্থ ছুঁচোর মতো হীন জীবনকে মারলে কোনও পৌরুষ লাভের মধ্যে হাতে ছুঁচোর গায়ের দুর্গন্ধ হয়। 'দেনাপাওয়া' গল্পে লেখক এক নয়া পদ্ধতিতে উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত প্রবাদের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সর্বজন বিদিত ও বহু পরিচিত প্রবাদের উল্লেখ করেন। গল্পে রামসুন্দর নিরুপমার বিয়ের পণের বাকি টাকার কিছু দিতে এসে; অনেকটা গৌরচন্দ্রিকা করার পর যখন রামসুন্দর অতি কষ্টে তিন হাজার টাকার নোট বার করলেন, তা দেখে বেহাই রায়বাহাদুর বলেন, — ''থাকা বেহাই, ওতে আমার কাজ নাই। একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।''[২১] অর্থাৎ তিনি

পণের পুরো টাকা চান, অল্প নিয়ে নিজেকে অসম্মানিত করতে চায় না।

'ছোটো মুখে বড় কথা' প্রবাদটি অতি পরিচিত, সর্বত্র অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে মুখে ব্যবহৃত। এটির অর্থ যার মুখে যে কথা শোভা পায় না, সেই মুখে সে কথাই বলা। 'দালিয়া' গল্পে দালিয়া একজন বর্বর জেলে সন্তান। সে শাহজাদী আমিনার শরীর স্পর্শ করতে পারে, তা আমিনা শাহজাদী জুলিখার সম্মুখে মেনে নিতে পারেনি। উভয়ের মধ্যে মনের পার্থক্য না থাকলেও, একটা বাহ্যিক পার্থক্য বোঝাতে জুলিখার কাছে রবীন্দ্রনাথ আমিনার মুখে এই প্রবাদটির ব্যবহার করে চরিত্রের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলেন।

'জলের মাছকে ডাঙায় তোলা' অর্থাৎ অতি সহজে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পোস্টমাস্টার কলকাতার ছেলে। শহুরে পরিবেশে সে অতিবাহিত। গ্রাম সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। চাকরি নিয়ে উলাপুর গ্রামে আসাতেই ডাঙার মাছের মতো তার করুণ পরিণতি দেখা যায়। তা লেখক কথিত ভাষায়, — ''আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে।''[২২] এই গল্পে লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে পোস্টমাস্টারের দুর্দশাকে উপস্থাপন করেছেন শব্দগুচ্ছটির মধ্যে দিয়ে।

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' এটি একটি প্রবাদাংশ। যদিও জনসমাজে এর ব্যবহারিক রূপ প্রবাদ হিসাবে প্রচলিত। যার অর্থ দুই দিকে বিপদ 'সমস্যাপূরণ' গল্পে তা লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গল্পে জমিদার পুত্র বিপিনবিহারীর জমিদারির দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর পিতার জমিদারির অধিনে থাকা অন্যান্য সকল প্রজাদের প্রতি দান খয়রাত বন্ধ করেন। তাদের দখলে থাকা অতিরিক্ত জমি বিভিন্ন উপায়ে পুত্র বিপিনবিহারী নিজের অধিনে নিয়ে আসেন। সকলে তাঁর ভয়ের বশ্যতা স্বীকার করলেও মির্জা বিবির পুত্র

অছিমদ্দি কিছুতেই বাগ মানল না। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে মামলা মকদ্দমা। দেনার দায়ে অছিমদ্দি আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়ার ঠিক প্রায় বছর দেড়েক পর আপিল-আদালতের রায়ে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং কিছুটা বেঁচেছে। ডাঙার বাঘরূপ বিপিনবিহারীর হাত থেকে যতটুকু বাঁচল, অন্যদিকে জলের কুমির অর্থাৎ বিপিনবিহারীর ডিক্রি জারি করে তা আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। তার পাল্টা আক্রমণ ঐ অছিমদ্দির উপরে। তবে অছিমদ্দির দুইদিকে বিপদের পরিমাণ বোঝাতে লেখক এই প্রবাদটির যথার্থ ব্যবহার করেছেন।

'তিলকে তাল করা' প্রবাদটির অর্থ, সামান্য ব্যাপারে অযথা অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে মরণকালে গুরুচরণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মহাসমারহে চিংড়িমাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়ে অন্তঃপুরে বসে পান্তাভাত খাচ্ছিল। তাকে যারা সহ্য করতে পারে না, তারাই এই খাওয়াকে তাস খেলার মতো করে প্রচার করেন, অর্থাৎ স্বামী যে মৃত্যুর পথযাত্রী তা যেন স্ত্রী হিসাবে তার কোনও খেয়াল নেই। তাতে সাধারণ মানুষের ধারণা, লেখকের ভাবনায়, — ''যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে।''[২৩] আসলে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য লেখক এই প্রবাদ বাক্যটির প্রয়োগ করেন, বাস্তব সমাজে এর ব্যবহার যথার্থ লক্ষণীয়।

'দুখের সাধ (স্বাধ) ঘোলে মেটানো' প্রবাদটি গল্পকার 'মুকুট' গল্পে যথার্থ ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পে একজন দইওয়ালার মাথা থেকে দইয়ের হাঁড়ি জনকলাহলের মধ্যে 'হাতে হাতে' বহুদূরে চলে যায়। তা দইওয়ালা হাঁ করে দেখতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে একজন বলল, — ''ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকশান হইল বৈ তো নয়।''[২৪] অর্থাৎ তারা দই পায়নি, বরং দইয়ের বদলে ঘোল খেয়ে দইয়ের স্বাদ মিটিয়েছে।

‘দুই নৌকায় পা’ বাগধারাটির অর্থ উভয় সংকট বা দুই দিকেই বিপদ। ‘রাজটিকা’ গল্পে নবেন্দু শ্যালীসঙ্গের প্রবল মোহ ছেড়ে বেরতে পারেনা ঠিক তেমনি বড়ো সাহেব কাছে সময় মতো হাজিরা না দিলে নবেন্দুর কর্মক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কারণ সে তৎকালীন ইংরেজ শাসকের কর্মরত কর্মচারী। একদিকে শ্যালী সংসর্গ আর অন্যদিকে সাহেব, এই দুই দিক ঠিকঠিক ভাবে সামলাতে নবেন্দু উভয় সংকটে পড়ে। এক্ষেত্রে লেখক ঠিকঠাক বাগধারাটি নির্বাচন করেছেন।

‘নবাবপুত্তুর’ শব্দগুচ্ছটি আমরা প্রচলিত বিশিষ্টার্থক শব্দ হিসাবে পাই। ‘দেনাপাওনা’ গল্পে গল্পকার পুরুষবাচক এই শব্দগুচ্ছকে নারীর উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে শব্দটির লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে নিরুপমা নিজের স্বাস্থ্যের উপর উদাসীন হলে শ্বাশুড়ি তা মেনে নিতে পারে না, খোঁটা দিয়ে বলেন, — ‘‘নবাবের বাড়ির মেয়ে কি না। গরিবের অন্ন ওর মুখে রোচে না।’’[২৫] ‘নবাবপুত্তুর’ শব্দগুচ্ছের মধ্যে যে শ্লেষটুকু আছে তা স্ত্রীলিঙ্গে পরিণতির পরেও কথ্য ভাষার ভঙ্গিমায় ঐ শ্লেষটুকু বিশেষ ভাবে বজায় আছে এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের মধ্যে।

‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’ এটি বিজ্ঞজনের মুখে মুখে প্রচলিত সংস্কৃতি প্রবাদাংশ। ‘পুত্রযজ্ঞ’ গল্পে বৈদ্যনাথ গ্রামের একজন বিজ্ঞব্যক্তিত্ব। তাই তিনি বর্তমানে যা কিছু করেন তা সবকিছু ভবিষ্যতের ফললাভের জন্য। তিনি পুৎনামক নরক থেকে পুত্রের মাধ্যমে উদ্ধার পাওয়ার আশায় বিনোদিনীকে বিবাহ করেন। যৌবনপ্রাপ্ত বিনোদিনীর নববিকশিত জীবন বিনা প্রেমে অতিবাহিত হোক তা তিনি কোনও ভাবেই চায়নি। তাই বৈদ্যনাথের ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’র স্বপ্ন পুরণের কর্তব্য বিনোদিনী পালন করেনি। কারণ এই বয়সে রমনীদের কাছে সকল কর্তব্যের চেয়ে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়ায় সবচেয়ে বড় সুখ। এই ঘটনায় বৈদ্যনাথ চিন্তিত।

বিনোদিনীর আশা পুরণ করা বৈদ্যনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার আশা অপূর্ণ থেকে যায়।

'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না' এটি একটি বিদেশী প্রবাদের তর্জমা। 'অসম্ভব কথা' গল্পে ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। লেখক বলেছেন শিশুকালে যখন রূপকথার গল্প শুনতেন তখন তিনি রাজার নাম, তার দেশের নাম, রানীর নাম, প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে কখনো গল্পের প্রবাহ নষ্ট বা রোধ করতেন না। কেবল গল্পের গতি গঠনগত অবয়ব এবং তার পরিণতির দিকে মনসংযোগ করতেন। কিছু জানতে চাইলে হয়ত মিথ্যা শুনতে হবে। সম্ভবত বালক এটা জানে, তাই সে কারণে রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু সত্যের মতো সরল হয়ে তার মানসে উপস্থিত হয়। পাঠকের কাছে এই ভাব প্রকাশের জন্য লেখক ইংরাজি প্রবাদটি সরাসরি ব্যবহার না করে তার ভাবার্থক বা বাংলা অর্থে গল্পে প্রয়োগ করেন। যদিও অনুদিত কিন্তু প্রয়োগ ভাব স্বার্থক।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এটি একটি বহু প্রচলিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ। যার অর্থ বিধাতা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বিবাহ ব্যবস্থা। প্রজাপতি ঋষির কৃপায় নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধন নির্ধারিত হয়। প্রজাপতি ঋষির আশীর্বাদ থাকলে এই বন্ধনে কোনও ভাবেই বাঁধা পড়ে না। তেমনটি ঘটেছে 'দিদি' গল্পের শশীকলা ও জয়গোপালের জীবনে। শশীকলা ও জয়গোপালের দীর্ঘ ষোলো বছর একত্রে থাকার পরও জয়গোপাল শশীকে রেখে আসামে চলে গেলে তাঁর বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদের সূত্রপাত। পরোক্ষভাবে বহুবার বিচ্ছেদ হলেও প্রজাপতি ঋষির বিবাহ বন্ধন কোনও ভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়নি। লেখক গল্পে এভাবে বলেছেন, — ''আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!''[২৬]

'বয়সের গাছ-পাথর' প্রবাদাঙ্গটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে লেখক 'মুক্তির উপায়' গল্পে প্রয়োগ করেছেন। এই পৃথিবীতে গাছ ও পাথর অনেক নিদর্শনের স্মৃতি হিসাবে আদি অনন্তকাল থেকে চিহ্নিত। তবে 'বয়সের গাছ-পাথর' নেই অর্থাৎ গাছ ও পাথরের মতো অনেক ব্যক্তির বয়সও সীমাহীন। উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত প্রবাদাঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রকাশ করেছেন, — ''তোমার কি বয়সের গাছ পাথর আছে।''[২৭] মাখনলালকে তার দুই স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে দেখছে। তাকে চিনতে তাদের ভুল হতে পারে না, তাই দুই রমণী একেবারে গ্রাম্য ঢংয়ে বলল, — ''ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাওনি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমার যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।''[২৮]

'বজ্রাঘাত বা বজ্রাহত' বিশিষ্টার্থক শব্দ দুটি সমূহ বিপদ অর্থে ব্যবহৃত। 'মহামায়া' গল্পে রাজীব ও মহামায়ার গোপন প্রণয় সম্পর্কটি জানা-জানি হলে মহামায়ার দাদা অকস্মাৎ এক কুলীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে বিবাহ দেন, আর তার পরের দিন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় মহামায়া বিধবা হয়। মহামায়ার জীবনের ঘটে যাওয়া বিবাহ ও সহমরণের ঘটনা রাজীবের কাছে দুঃখের সংবাদ। লেখক প্রসঙ্গটি এভাবে তুলে ধরেন, — ''যেদিন বিবাহ তাহার পরদিন মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না — এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদ যেরূপে বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইরূপ হইল না। এমন-কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে — ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপতিত করিয়া ফেলিল।''[২৯] মহামায়াকে কেন্দ্র করে রাজীবের জীবনে আসা হঠাৎ দুঃখ এবং কষ্টের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে বিশিষ্টার্থক শব্দ দুটির প্রয়োগ যথার্থ। আবার একই অর্থে 'নামমঞ্জুর গল্প' ও

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে 'বজ্রাঘাত' আর 'শাস্তি', 'দিদি' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ 'বজ্রাহত' বিশিষ্টার্থক শব্দটি ব্যবহার করেন।

'বর্গির হাঙ্গামা বা আক্রমণ' 'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী বাবার আদরের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই গ্রামে তার ইচ্ছামত সে সব কিছু করে বেড়াত, সে একজন মেয়ে হয়ে তার সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তার খেলা ধূলা, ঘোরাফেরা সবকিছু চলত গ্রামের সব ছেলে সঙ্গীদের সাথে। তার এই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য গ্রামের গৃহিণীরা চিন্তিত এবং ভীত, মৃন্ময়ীর জন্য তাদের ছেলে-মেয়েদের কোনও না ক্ষতি হয়। তার চরিত্রের এই গুণকে পাঠক সমক্ষে প্রকাশ করার জন্য লেখক এরূপ বিশিষ্টার্থক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে বৃহৎবঙ্গের মাটিতে মাঝে মাঝে যেমন বর্গির আক্রমণ হত, ঠিক তেমনি জমিদার মতিবাবুর কাছে আশ্রিত তারাপদর পাঠগৃহে মতিবাবুর একমাত্র কন্যা চারুশশী, সে পাঠশালায় গিয়ে কখনো রাগ, অনুরাগ এবং বিরাগের দ্বারা সে তারাপদর পাঠচর্যা ভঙ্গ করে দিত। অর্থাৎ মনযোগে বিঘ্ন ঘটায় ঠিক যেমনটি করত বর্গিরা। 'অতিথি' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন তারাপদর পঠশালায় চারুশশীর যাওয়া যেন বর্গি আসার সামিল। কারণ সে এলেই তারাপদর আর কোনও কাজ হত না, পূর্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও এখন সে আর কিছুই বলে না। দেশে এই বর্গি এলে কি ঘটত তা সকলেরই জানা। সেই প্রসঙ্গে এই বিশিষ্টার্থক শব্দটি লেখক যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন চারুশশীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। পাঠশালায় চারুশশীর উপস্থিতি বর্গির আগমনকে স্মরণ করায়।

'বিন্দু বিসর্গ' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ কোনও কিছুর অত্যাল্প মাত্র। 'দুরাশা' গল্পে লেখকের দার্জিলিং ভ্রমণকালে এক হিন্দিভাষী সন্ন্যাসিনীর একাকিনী কুয়াশাছন্ন প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসে তাঁর কান্নার রহস্য জানতে চায়। সে সময় সন্ন্যাসিনী তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন, --- ''আমি বদ্রাত্তনের নবাব

গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।"[৩০] লেখক স্বপ্নে ভাবতে পারেননি যে নবাব বংশের কন্যা নুরউন্নীসা সন্ন্যাসিনী বেশ ধরে দার্জিলিং এর ক্যালকাটা রোডের ধারে কাঁদতে পারে, এই দৃশ্য লেখকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানে বিশিষ্টার্থক শব্দটি তিলমাত্র বিশ্বাস না করার অর্থে বিন্দুবিসর্গ শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'বালির বাঁধ' বাগধারাটির অর্থ ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাসরাজ্যের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বাগধারাটির প্রকৃত অর্থ বজায় রেখে নতুন কৌশলে এইভাবে প্রয়োগ করেন, ---- "জোয়ারভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম থম করিতেছে - কথা নাই, কেবল মুখ-চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে।"[৩১] যা তাসের ঘরের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়বে। তাসরাজ্যে গিয়ে রাজকুমারের দেখা কাল্পনিক স্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে বালির স্তূপের মতো ভেঙে পড়ছে। এ মানুষের দেশ নয়, সাহেব, গোলাম, বিবির পরিচালিত দেশ।

'ব্রাহ্মণের জাত মারা' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তফাৎ। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ, শূদ্র নিকৃষ্ট, তাই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। 'ত্যাগ' গল্পে গল্পকার কাহিনি বর্ণনাতে তা সুষ্পষ্ট করেছেন। প্যারিশঙ্কর মেয়ের এবং নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে হরিহরের পুত্র হেমন্তের সঙ্গে অকুলীন মেয়ে কুসুমকে কুলীন পরিচয়ে বিবাহ দেয়। তাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনও পার্থক্য রইল না। ব্রাহ্মণ্য সমাজে শূদ্ররা কতটা নিম্ন বা অবহেলিত তা হরিহর মুখুর্জের ক্রুদ্ধ গর্জনে তা স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ ঘরে শূদ্র কণ্যার কোনও স্থান নেই।

'মরণকালে বুদ্ধিনাশ' এই প্রবাদবাক্যটি গল্পকার যথার্থ ভাবে ব্যবহার করেন। যার অর্থ বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে নবদ্বীপের মা মনে করেছিল যে তার অপুত্রক জ্যাঠামশায় অন্তত পক্ষে মৃত্যুকালে তাঁর সব বিষয়সম্পত্তি একমাত্র পুত্র নবদ্বীপকে দিয়ে যাবে। কিন্তু তার এই আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে গুরুচরণ তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর নিজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নামে উইল করেন, লেখক কথিত ভাবনায়, — ''উইলের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল - বলিল, মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয় এমন সোনার চাঁদ ভাইপো থাকিতে।''[৩২] নবদ্বীপের মায়ের ভাবনার সাথে গুরুচরণের ভাবনার সাদৃশ্য না থাকাই এ রকম বিষময় উক্তি করেন গ্রাম্য মনের রমনী নবদ্বীপের মা। আর এই কাজটা তাঁর বুদ্ধিহীনের পরিচয়, তিনি উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত প্রবাদে তা বোঝাতে চাইলেন।

'মধুও আছে হুলও আছে' 'রাজটিকা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ মূল প্রবাদটিকে 'মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি' রূপে ব্যবহার করেন। গল্পের নবেন্দুশেখর প্রমথনাথের পরিবারের মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাই শ্যালীকা সংসর্গে তিনি আনন্দে দিন কাটাত। তিনি যেনই শ্যালীকাদের আনন্দ উপভোগের বস্তু। যদিও মনে মনে নবেন্দু রাগান্বিত হয়, কিন্তু তিনি শ্যালীকাদেরকে ছাড়তে পারেন না। তাই বড়ো শ্যালীকা সম্বন্ধে নবেন্দু বলেছেন, — ''বিশেষ করে বড়ো শ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে।''[৩৩] ফুলের মাধূর্য যেমন তার কাঁটার জ্বালা সহ্য করতে হয়, ঠিক তেমনি শ্যালীকাদের কাছে থেকে হাস্যরস লাভ করার জন্য মাঝে মাঝে জ্বালাও নবেন্দুকে স্বীকার করতে হয়। এই কারণে শ্যালীকাদের মধ্যে মধুও আছে হুলও আছে। এখানে লেখক প্রবাদটি সরাসরি ব্যবহার না করে তার মূল অর্থকে অপরিবর্তীত রেখে

নিজের মতো করে চরিত্রের কথন ভাষ্যে যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।

'মায়াকান্না' এটি একটি বিশিষ্টার্থক শব্দ, যার ব্যঞ্জনার্থ হল মায়াজনিত কান্না। আবার এই বিশিষ্টার্থক শব্দের বাচ্যার্থ আছে, যা লোককে দেখানো ন্যাকা কান্না বলে পরিচিত। এখানে বিশিষ্টার্থক শব্দটির দ্বৈত অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। 'রামকানাইয়ের নির্বূদ্ধিতা' গল্পে গুরুচরণের পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশিরা মনের করেছিল যে গুরুচরণের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রামকানাইয়ের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ পাবে। কিন্তু গুরুচরণ তা না করে তাঁর সব কিছু দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে উইল করে যান। তাতে তাঁর পরিবারের লোকেরা আশাহত হয়। আর এই আশাহতদের কাছে গুরুচরণের স্ত্রীর শোক জনিত কান্না লোক দেখানো বা ন্যাকামির কান্না বলে মনে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গুরুচরণের স্ত্রীর কান্না পতি বিয়োগের মায়া জনিত কান্না। তবে এই আশাহতদের মনের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য 'মায়াকান্না' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছেন।

'মান্ধাতার আমল' বাগধারাটির অর্থ বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসারীতি। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এক অলীক ঘটনায় তাসরাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে বলেছেন, — ''তাহাদের মুখে কোনো ভাবে পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল-ফ্যাল ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।''[৩৪] অর্থাৎ দীর্ঘদিন চলে আসার নিয়ম তাসরাজ্যের মানুষের মধ্যে অপরিবর্তীত ছিল সেই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত বাগধারাটি প্রযুক্ত করেছেন।

'মাথায় বজ্রাঘাত' অর্থাৎ অকস্মাৎ মহাবিপদের উপস্থিতি। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কথক মিনির বাবা এক দিকে প্রকৃতি প্রেমিক ও ভ্রমণ পিপাষু। আবার অন্যদিকে নিজের ঘর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া যেন তাঁর কাছে বিপদের আগমন।

এই প্রসঙ্গানুসারে উদ্ধৃতি চিহ্নের বাগধারাটি রবীন্দ্রনাথ এভাবে উল্লেখ করেন যে, — ''এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ প্রকৃতি যে, আমার কোণ টুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত।''[৩৫] মিনির বাবা নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অলসতার চিহ্ন হিসাবে লেখক এই বাগধারাটির প্রয়োগ করেন।

'মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর' প্রবাদটির অর্থ ওপরে ওপরে অতি ভদ্রতা, আর মনে মনে শয়তানি। গুরুচরণের বিষয় সম্পত্তি দখল করার জন্য মা ছেলে মিলে একটা গোপন ষড়যন্ত্র করে, আর তাতে বাঁধা হতে পারে নবদ্বীপের বাবা, যে একমাত্র গুরুচরণের বলা উইলের লেখক এবং সাক্ষী। এই সাক্ষী লোপাটের জন্য নবদ্বীপের মা, যে কোনও দিন স্বামীকে ভালোবাসেনি, হটাৎ সে অতিরিক্ত সম্মান ও আদরের সঙ্গে রামকানাইকে কাশী যাওয়ার অনুরোধ করতে থাকে। নকল উইলের বিষয়টি আদালতে যখন পরিপূর্ণ ভাবে ঘোট পেকে ওঠে, তখন নবদ্বীপের মা স্বামী রামকানাইকে ডেকে আনেন। যথারীতি তিনি উপস্থিত হয়, এবং দীর্ঘদিন কাশীতে থাকার সময় স্ত্রীর কোনও খোঁজ খবর সে রাখেনি, তা নিয়ে নবদ্বীপের মা অভিযোগ অনর্থক, কারণ রামকানাইকে কাশীতে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল, সেটি তিনি ভালোভাবে বুঝেছিলেন, স্ত্রীর এই রুচির প্রতি ধিক্কার দিয়ে লেখক রামকানাইয়ের মুখ থেকে উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত প্রবাদটি যথোপযুক্ত ভাবে এবং যথা স্থানে প্রয়োগ করেন।

'মুখ হাঁড়ি করা' অর্থাৎ মুখ হাঁড়ির মতো আকৃতির করা। 'অসম্ভব কথা' গল্পে লেখক তথা কথক বলেছেন বৃষ্টির দিনের কারোর পড়াশুনা করতে ভালো লাগেনা। ঐ দিনে মাষ্টার যাতে না আসতে পারে তার জন্য তিনি বৃষ্টি বন্ধ না হওয়ার প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে মাষ্টারের উপস্থিতি দেখে

বিরক্ত হয়ে মা দিদিমার কাছে হাজির হয়। অসুখের অছিলায় পড়তে না যাওয়ার ভান করে মায়ের পাশে শুয়ে পড়েন। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটি লেখক এভাবেই পাঠক কে বলেছেন — ''ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। ..... ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে।' আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, 'আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইবনা।''[৩৬] 'মাষ্টারমশায়' গল্পে একই অর্থে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' প্রবাদটির অর্থ শেষ সময় পর্যন্ত সাফল্যের জন চেষ্টা না ছাড়া। 'রাজটিকা' গল্পে নবেন্দুশেখর ইংরেজ সাহেবদের কাছ থেকে থেকে বিশেষ আনুগত্য লাভের জন্য ইংরেজদের একটি শখের শহরে বহুব্যায়সাধ্য ঘোড়া দৌড়ের স্থান তৈরী করেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে কনগ্রেসের সময় নিকট হলে লাবণ্যের স্বামীর কাছে চাঁদা চাই, কিন্তু অন্যদিকে নীলরতন কন্‌গ্রেসের চাঁদা সংগ্রহের খবর যথাভাবে খবরের কাগজে **X** স্বাক্ষরে প্রকাশ করেন। এতে নবেন্দু জনসমক্ষে মনে মনে অপমানিত হয়। এক্ষেত্রে নীলরতন ও লাবণ্য এর প্রতিবাদী চিঠি লিখতে বললে, তাতে নবেন্দু কোনও সদউত্তর দেয়নি। এমনকি সে প্রতিবাদে ভয়ও করে না তা নীলরতন ও লাবণ্যকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল। তাই লাবণ্যের সুখে নবেন্দুর প্রাণপণ চেষ্টার কথা লেখক এভাবে প্রকাশ করেছেন, — ''আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশা ভরসা সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনো ছাড়ে নাই — যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।[৩৭] সংবাদ পত্র কন্‌গ্রেসের নিন্দা বা বন্ধ করার যতই চেষ্টা করুক না কেন লাবণ্যের কথায় নবেন্দু তা রক্ষা করার জন্য শেষ সময় পর্যন্ত চেষ্টা চালাবে।

'যুদ্ধং দেহি' অর্থাৎ প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান। 'জয়পরাজয়' গল্পে রাজা উদয়নারায়ণের রাজসভার সভাকবি শেখর কাব্যপ্রতিভার একছত্রাধিপতি, তাঁর

এইপ্রতিভার প্রতি দাক্ষিণাত্যের কবি পুণ্ডরীক কাব্যযুদ্ধের আহ্বান করেন। স্বদেশ থেকে আরম্ভ করে তিনি একে একে সকলকে পরাস্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে দুই শব্দের সংস্কৃত প্রবাদটি ব্যবহার করে শেখর ও পুণ্ডরীকের মধ্যে কে কত বেশি প্রতিভাবান তার সাক্ষ্য রেখেছেন। তবে গল্পের কনটেক্স অনুসারে লেখকের শব্দটি নির্বাচন যথার্থ হয়েছে।

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখগের প্রাণ যায়' প্রবাদটি 'দৃষ্টিদান' গল্পে কুমুর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, — ''আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলখড়েই বিপদ সব চেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুই পক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকে।''[৩৮] কুমুর অন্ধ চোখের চিকিৎসা নিয়ে কুমুর ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে উকিল দাদার বিবাদ শুরু হয়। একদিকে স্বামী আর অন্যদিকে দাদা, এই উভয় সংকটে পড়ে কুমু চিন্তিত। কুমুর চোখের চিকিৎসার ভালো-মন্দ নিয়ে উভয়ের বাক বিতণ্ডায় কুমুর অবস্থা একেবারে উলুখড়ের মতো। এখানে চরিত্রের ব্যবহারিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে লেখকের প্রবাদটির প্রয়োগ যথার্থ বলা যায়।

'শত্রুর মুখে ভস্ম/ছাই দেওয়া' অর্থাৎ কোনও কিছুর জন্য শত্রুর মনে যে ঈর্ষা জন্মায় তা ব্যর্থ করে নিশ্চিন্তে সুখভোগ করা। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে নবদ্বীপের মা গুরুচরণের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির লোভে, প্রতিবেশিদের কোনও নিষেধ না শুনে অল্প বয়স্ক নবদ্বীপকে তার মা জোর করে বিয়ে দেয়। লেখকের ভাষায়, — ''তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামশায়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। ..... এই আশায় নবদ্বীপের মা ছেলেকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই, সকাল-সকাল বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নিষ্ফল হয় নাই।''[৩৯] সুতরাং এখানে প্রবাদটি পরিস্থিতি জ্ঞাপক প্রবাদ হিসাবে লেখক প্রয়োগ করেন। একই অর্থে 'মুক্তির উপায়' এবং 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে উদ্ধৃতি

চিহ্নের মধ্যে প্রবাদটির ব্যবহার হয়েছে।

'যোলো-আনা' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণরূপে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে মিনিকে দেওয়া বাদাম-কিসমিসের দাম স্বরূপ মিনির বাবা কাবুলিওয়ালাকে একটা আধুলি দিয়েছিলেন। তবে কাবুলিওয়ালা ঐ আধুলিটি না নিয়ে যাওয়ার সময় মিনিকে দিয়ে যান, তাতে শুরু হয় মা ও মেয়ের মধ্যে গোলযোগ যা অনেকক্ষণ ধরে চলেছে তা মিনির বাবার বুঝতে আর বাকি ছিল না। লেখক বিশিষ্টার্থক শব্দটিকে গোলযোগের পরিপূর্ণতা বোঝাতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। উদ্ধৃতি চিহ্নের বিশিষ্টার্থক শব্দটি তিনি অর্থের কোনও পরিবর্তন না করে বিভিন্ন কনটেক্স অনুসারে কোথাও ভয়ের পরিপূর্ণতা, কোথাও গোলযোগ, বিশ্বাস, সঠিক কাজে ব্যবহার, আবার কোথাও প্রভুত্বের অধিকারের সম্পূর্ণতা বোঝাতে 'অসম্ভব কথা', 'অনধিকার প্রবেশ', 'পুত্রযজ্ঞ' প্রভৃতি গল্পে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করেন।

'সাতরাজার-ধন মাণিক' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ মহামূল্য বস্তু যে সাতজন রাজার ঐশ্বর্য তাহার সমতুল্য। 'মুকুট' গল্পে কমলাদেবীর মুখে এই শব্দগুচ্ছটি উত্থাপিত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর অতিআদরের ধন, তাই কমলাদেবী রাজাধরকে ইন্দ্রকুমারের কাছে 'সাতরাজার-ধন মাণিক' বলে চিহ্নিত করেন।

''সাতরাজার-ধন মাণিক'' শব্দগুচ্ছটি 'আপদ' গল্পে ঐ শব্দগুচ্ছটি অর্থ অপরিবর্তিত রেখে ভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেন।

'আপদ' গল্পে নীলকান্ত জন্ম থেকে পিতামাতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার জগৎ থেকে অনেক দূরে তার অবস্থান। যে যাত্রার দলে গান করে দুঃখকে ভুলে থাকে। কিন্তু দিনের শেষে সে যখন শয্যায় শয়ন করতে যায়, তখন তার কষ্টের দিনগুলি চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। লেখকের বক্তব্য এই অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য শিশু যখন সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে রাজপুত্র

রাজকন্যার এবং 'সাতরাজার-ধন মাণিক' এর কথা শুনে নিজেকে দারিদ্র ও হীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, এবং নিজেকে রূপকথার রাজ্যে উত্তীর্ণ করার অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করতে চাই।

'সোনার চাঁদ' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল রূপে-গুণে পরম সুন্দর পুরুষ বা নারী। 'মুকুট' গল্পে কমলাদেবীর মুখে শব্দগুচ্ছটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন। রাজা অমরমাণিক্যের অতিমূল্যবান এবং সবচেয়ে প্রিয় পুত্র হিসাবে রাজাধরকে ইন্দ্রকুমারের কাছে কমলাদেবী 'সোনার চাঁদ' বলে চিহ্নিত করেন। আবার একই অর্থে ''সোনার চাঁদ'' শব্দগুচ্ছটি 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে মৃত্যুমুখে পতিত গুরুচরণ, তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ভাইপো নবদ্বীপের নামে না দিয়ে, নিজের দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে উইল করেন। লেখকের কথিত ভাবনায়, ---- ''উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল- বলিল, মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার চাঁদ ভাইপো থাকিতে।''[৪০] এই সম্পত্তির আশায় তারা নবদ্বীপকে চাকরি করতে না দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাও ফসকে গেল।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে পাগল বরের সঙ্গে বিন্দুর অজানতে বিয়ে হয়। মাঝে মাঝে তার পাগলামির অত্যাচারে ভিত হয়ে এক সময় বিন্দু বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসে। তাতে শ্বশুড়বাড়ির লোকজন বিন্দুকে দোষারোপ করে, এবং বিন্দুর শ্বাশুড়ি বলেন, — ''তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেল ছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করতে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।''[৪১] নিজের ছেলে শত মন্দ হলেও সে মা ও বাড়ির লোকজনের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র তা বোঝাতে লেখক শব্দগুচ্ছটির সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এখানে লেখক আরো কিছু প্রবাদবাক্যাংশের ব্যবহার করেছেন। 'মুসলমানের মুরগি বাৎসল্য' উপরে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে নবদ্বীপের মা বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বামী রামকানাইকে তীর্থযাত্রার জন্য কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে রামকানাই একদিনও স্ত্রীর খোঁজ নেয়নি, তাতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনও ভালোবাসা নেই, তা মনে করে নিয়ে নবদ্বীপের মা রামকানাইকে চরম অভিযোগ করতে থাকে। পুরুষের ভালোবাসার স্থায়ীত্ব নিয়ে নিজের মধ্যে সংশয় থাকায় নবদ্বীপের মা ভালোবাসার বিশ্বাসের উপর এরূপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা বলার কারণ, মুসলমান মুরগি পোষে তৃপ্তি করে ভোজনের জন্য, তা আদর করে ঘরে রাখার জন্য নয়। অর্থাৎ স্ত্রীর রূপ ও যৌবন শেষ হলে, তাদের প্রতি পুরুষের কোনও ভালোবাসা থাকে না, যতটা থাকে অন্য মেয়েদের প্রতি। তাই তার ধারণা স্বামীর ভালোবাসা মুসলমানের মুরগি পোষার মতো।

'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্প' গল্পে এক নির্বাসিত রাজপুত্রের রূপকথার কল্পনাকাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন। যে কাঠির মাধ্যমে দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারীর ঘুমভাঙে, এবং এই কাঠি দিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করার স্বপ্ন সে দেখতে থাকে। এই কল্পনা প্রসঙ্গে লেখক 'সাপের মাথায় মানিক', 'সাত সমুদ্র তেরো নদীপারে' প্রভৃতি বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছগুলি যুক্তিসংগত ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকারী' প্রবাদটি একটি সংস্কৃত শ্লোকাংশ। যদিও এটি প্রবাদ হিসাবে গণ্য ও প্রচলিত। প্রবাদটির অর্থ হল স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে চলা আর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের সম্মুখীন হওয়া সমান। 'মণিহারা' গল্পে গল্পকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে ফণিভূষণ ও মণিমালিকার দাম্পত্য জীবন কাহিনি শোনার পর

ফণিভূষণের ভালোমানুষির সমালোচনা করেছেন। মণিমালিকা অন্তরে স্বামীর অস্তিত্বের কোনও অনুভব ছিল না। ফণিভূষণের বিপদের সম্ভবনা দেখে স্ত্রী মণিমালিকা স্বামীর প্রতি সন্দেহ বশত তাঁর সমস্ত গহনা নিয়ে নিজের বুদ্ধিতে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলত ফণিভূষণের ভালোবাসার সংসার গেল ভেঙ্গে। এই দিকটি লেখক ভালো চোখে দেখেননি, বরং সমালোচনার সুরে বলেছেন, — ''ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদি যুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে।''[৪২] সুতরাং গল্পে মণিমালিকা যে পরিচয় পাঠককের সম্মুখে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে লেখকের ব্যবহৃত প্রবাদটি নির্বাচন ও প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। এখানে চরিত্রের চারিত্রিক আচরণও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে গল্পকার প্রবাদটি ব্যবহার করেন।

'হাতে হাতে' শব্দগুচ্ছটির অর্থ কাল বিলম্ব না করে বা সঙ্গে সঙ্গে। 'মুকুট' গল্পে 'হাতে হাতে' শব্দগুচ্ছটি রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ব্যবহার করেন। তিনি গল্পে বলছেন, — ''একজন একহাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথের জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল — হঠাৎ দেখে তার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই - দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।''[৪৩] 'দেনাপাওয়ানা' গল্পে একই অর্থে 'হাতে হাতে' শব্দগুচ্ছটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেন।

'হিতে বিপরীত' শব্দগুচ্ছটিকে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ গল্পের মধ্যে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটির অর্থ উল্টে উৎপত্তি। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'

গল্পে রামকানাই এর স্ত্রী একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। সে নিজের প্রয়োজন টুকু বোঝে। তিনি যখন শুনলেন নিজের স্বামীর দোষে নবদ্বীপ তার পাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন সে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে রামকানাইয়ের উপর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এর পর রামকানাই কোনও উচ্চবাচ্চ করেনি। গল্পে বর্ণিত ভাষায়, — ''রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই সকল উৎকট কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা নিবারণ উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে।''[৪৪] অর্থাৎ স্ত্রী যা বলছে সেটা গায়ে মেখে নেওয়া তার পক্ষে ভালো। 'নিশীথ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে রবীন্দ্রনাথ একই অর্থে শব্দগুচ্ছটি প্রয়োগ করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৮৯৩, পৃ-৩৫

২। পাল, প্রশান্ত 'রবিজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা - ১৮০

৩। চক্রবর্তী, বারিদাবরণ 'বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯১১, পৃষ্ঠা - ২৫

৪। পাল, প্রশান্ত 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা - ১৬৮

৫। পাল, প্রশান্ত 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা - ১২৩

৬। পাল, প্রশান্ত 'রবিজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা - ৬৯

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (নবম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা - ২৪

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৪

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ২১

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯০

১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

১২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৯

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২২৩

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৬

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮০

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮০

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

২০। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮

২২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৬

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩১

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৫

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা ২২১

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫

২৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১২০-১২১

৩০। তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৪

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা ৮১

৩২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯১

৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৭

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৯

৩৭। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৪

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০৬

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২

৪০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২

৪১। তদেব, পৃষ্ঠা ৫০৪

৪২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০২

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩